এ জীবন লইয়া কী করিব
ও অন্যান্য বক্তৃতা

[বক্তৃতা]

এ জীবন লইয়া কী করিব ও অন্যান্য বক্তৃতা

শাহাদুজ্জামান

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-000-2

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

এ জী ব ন ল ই য়া কী ক রি ব ও অ ন্যা ন্য ব ক্তৃ তা
শাহাদুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪৩২, জুন ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ ও বইনকশা : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩৯৮ টাকা

A Jibon Loiya Ami Ki Koribo
A Collective Speeches by Shahaduzzaman

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer
Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

যারা আমার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন

ভূ মি কা

বিভিন্ন সময়ে নানা সংগঠনের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিয়েছি বিবিধ প্রসঙ্গে। বিষয়গুলো সাহিত্য এবং সমসাময়িক সমাজভাবনা-সংক্রান্ত। নির্বাচিত কয়েকটি বক্তৃতার অনুলিপি এই বইয়ে সংকলিত হলো। এই লেখাগুলোর কয়েকটি আমার অন্য বইয়ে সংযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ে ছড়িয়ে থাকা বক্তৃতাগুলোকে একটি বইয়ে সংকলিত করার এ উদ্যোগের জন্য *বেঙ্গলবুকস*কে স্বাগত জানাই। বক্তৃতাগুলোর প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া আছে। অনুলিখনের সময় কিছুটা পরিমার্জনা করা হয়েছে, তবে বক্তৃতার মেজাজটি অটুট রাখা হয়েছে।

শাহাদুজ্জামান
জুন, ২০২৫

সূ চি

বিশ্বায়নের কালে লেখালেখি | ১১
ডিজিটাল মানব | ৩৫
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে উপনিবেশবাদের নির্মাণ | ৫৫
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : টুকরো ভাবনা | ৮৭
শহীদুল জহিরের দিকে দেখি | ১০৯
এস এম সুলতানের ভুবন | ১৩৭
এ জীবন লইয়া কী করিব | ১৬০

পিকাসো যেমন বলেছিলেন শিল্প হচ্ছে একটা মিথ্যা, যা সত্যকে বুঝতে সাহায্য করে। আমি অক্ষর দিয়ে একটা মিথ্যা জীবন রচনা করতে করতে আমার এই সত্যিকার জীবনটাকে বুঝবার চেষ্টা করি, বিশ্বায়নের যে চাপ সেটাকেও মোকাবিলা করার চেষ্টা করি। চ্যাপলিনের কথাটা আমার পছন্দের। তিনি বলেছিলেন শিল্প হচ্ছে 'আ লাভ লেটার টু দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়েল রিটেন।' শিল্প হচ্ছে পৃথিবীর কাছে লেখা একটা প্রেমপত্র কিন্তু সুলিখিত

বিশ্বায়নের কালে লেখালেখি

বিশ্বায়নের কালে লেখালেখি

[এই শিরোনামে লেখক বক্তৃতা দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, 'বাংলার পাঠশালা' এবং চট্টগ্রামের 'বিষাদ বাংলা'য় ২০১২ সালে।]

আমরা এমন একটা সময়ে এখন বাস করছি, যখন বিশ্বায়ন আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যে পেশাতেই থাকি না কেন, বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অভিঘাত আমাদের ওপর এসে পড়ছে। বাংলা ভাষার একজন কথাসাহিত্য চর্চাকারী হিসেবেও বিশ্বায়নের সেই অভিঘাত বরাবর অনুভব করি। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বায়নের একটা বাড়তি চাপ আমার ওপর থাকে। আমার পেশাগত কাজের বিষয় বিশ্বস্বাস্থ্য। বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার কাজে আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হয়। সেই সঙ্গে এই মুহূর্তে ব্রিটেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ক অধ্যাপনার কাজে জড়িত আছি। ফলে বিশ্বায়ন এবং স্বাস্থ্যের আন্তঃসম্পর্ক আমার পেশাগত কাজের একটি বিষয়। তবে আজকে আমি একজন লেখক হিসেবে বিশ্বায়নের এই যুগে লেখালেখি করতে গিয়ে যে ভাবনা এবং অভিজ্ঞতাগুলো দিয়ে তাড়িত হই, সে বিষয়েই কিছু কথা বলবার চেষ্টা করব।

বিশ্বায়নের তো নানা রকম একাডেমিক সংজ্ঞা আছে। আমি বরং একটা মজার সংজ্ঞা দিয়েই শুরু করি। কিছুদিন আগে ইন্টারনেটে বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের একটা

সংজ্ঞা পড়ছিলাম। যিনি সংজ্ঞা দিচ্ছেন তিনি লিখছেন, গ্লোবালাইজেশনের একটা ভালো উদাহরণ হচ্ছে প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু। কেন? তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, ডায়ানার মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এক ব্রিটিশ রাজকুমারী তার ইজিপশিয়ান বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের রাস্তায় জার্মানির একটি গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলেন। তার গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন একজন বেলজিয়ান। এ সময় কয়জন ইতালিয়ান পাপারাজ্জির খপ্পরে পড়েই গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করে। অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর যে ডাক্তার প্রথম ডায়ানাকে চিকিৎসা করেছিলেন তিনি একজন আমেরিকান এবং যে ওষুধগুলো দিয়ে তার চিকিৎসা করা হয়েছিল সেগুলো তৈরি হয়েছিল ব্রাজিলে। তারপর তিনি লিখছেন, যে কম্পিউটারে আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই সংজ্ঞাটি পড়ছেন সেটি তৈরি হয়েছে সিঙ্গাপুরে এবং তৈরি করেছেন কিছু বাংলাদেশি শ্রমিক। সুতরাং ডায়ানার মৃত্যুকে আমরা গ্লোবালাইজেশনের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবেই ধরতে পারি।

ব্যাপারটা ঠাট্টা করে বলা হলেও এর ভেতর বিশ্বায়নের মূল প্রবণতার কথাটা আছে। এ ঘটনায় আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখছি ভৌগোলিক সীমানা ভেঙে একটা দেশ ঢুকে গেছে আরেকটা দেশের ভেতরে। এটা বিশ্বায়নের একটা প্রধান প্রবণতা। গ্লোবালাইজেশনের আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞায় বলা হয়, গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে, 'গ্লোবাল সারকুলেশন অব পিপল, কমোডিটি অ্যান্ড আইডিয়া।' অন্যভাবে বললে, মানুষ, পণ্য আর চিন্তার বিশ্বব্যাপী চলাচলই হচ্ছে বিশ্বায়নের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন হচ্ছে এই চলাচল কি খুব নতুন কোনো ব্যাপার? বাস্তবিক তা তো না। এই চলাচল কিন্তু বহু শত বছর ধরেই চলছে। হাজার বছর আগে থেকেই আরবের ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে ব্যবসা করত। ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মমত একটা বিশেষ দেশে জন্ম নিলেও ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। এরপর ঔপনিবেশিক

আমলে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের পণ্য, মানুষ ও চিন্তা নিয়ে সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। সুতরাং যে চলাচলের কথা আমরা বলছি, সেটা নতুন কোনো ব্যাপার না। এই শতাব্দীতে এসে নতুন যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে সেই চলাচলের মাত্রা, বিস্তার এবং এর ধরনের ব্যাপকতা। এই যুগে যে ব্যাপক তীব্রতায়, ব্যাপক বিস্তারে এবং বিচিত্র ধরনে দেশে দেশে চিন্তা, পণ্য এবং মানুষের চলাচল ঘটছে, ইতিহাসে এমন আর ঘটেনি কখনও। ফলে যেটা হচ্ছে, পৃথিবীর দূরবর্তী কোনো মানচিত্রের একটা ঘটনা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি যে ভৌগোলিক অবস্থানে জীবনযাপন করছি, আমার জীবন অভিজ্ঞতা, আমার সুখ-দুঃখ শুধু সেই ভৌগোলিক সীমানার ঘটনাবলি দিয়েই নির্ধারিত হচ্ছে না আর।

কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি ঢাকায় যে ফ্ল্যাটে থাকি, সেদিন দেখলাম সে ফ্ল্যাটের বয়স্ক দারোয়ান কাঁদছেন। কী কারণে কাঁদছেন? জানলাম কাঁদছেন কারণ লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতন হয়েছে। গাদ্দাফির পতন হওয়াতে তার সংসারে নেমে এসেছে গভীর শোক। কারণ, দারোয়ানের যে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেটি শ্রমিক হিসেবে লিবিয়াতে কাজ করত, গাদ্দাফির পতনের পর তাকে লিবিয়া ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে আমি স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা করেছি। মনে আছে, মুক্তাগাছার একটি গ্রামে একবার ভিলেজ ম্যাপিং করছি। এটি গবেষণার একটি পদ্ধতি, যাতে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিলে সেই গ্রামটির একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়। পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাপিং প্রক্রিয়া দেখতে দেখতে এক বুড়ো মানুষ আমাকে এসে বললেন, 'ভাই, এই যে আপনি ম্যাপটা বানাইতেছেন, এইটা আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের হাতে পড়বে না তো? তাইলে বুশ তো এই ম্যাপ দেইখা আবার আমাদের গ্রামে বোম ফালাইতে পারে।' এটা জর্জ বুশের ইরাক আক্রমণের সময়ের কথা।

আবার ধরুন, এবার ঈদের ছুটিতে ব্রিটেন থেকে দেশে

এলাম। রাতে কোরবানির পোলাও মাংস খেয়ে সবাই বসেছে টেলিভিশনে ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠান দেখতে। আমি এক ফাঁকে বললাম, একটু খবরটা দেখি। বিবিসির খবর শুনতে গিয়ে দেখলাম, সিরিয়ায় সরকারি আর বিদ্রোহী বাহিনীর পাল্টাপাল্টি আক্রমণে অনেকগুলো নিরীহ শিশু মারা গেছে। পর্দায় সেইসব শিশুর মৃতদেহ। এরপর চ্যানেল ঘুরিয়ে যতই ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠানে ফিরে আসি না কেন, সেইসব মৃতশিশুর মুখ তো মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায় না। আবার একবার গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় ফিরছিলাম বাসে। আমার পাশে বসা এক তরুণ। তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জানতে চাইলাম কী কাজে সে ঢাকা যাচ্ছে? সে বলল যে একটা ফুলপ্যান্ট কিনতে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম গাইবান্ধায় প্যান্ট পাওয়া যায় না? সে বলল, পাওয়া যায়, কিন্তু তার এক প্রিয় ভারতীয় নায়ক যে ব্র্যান্ডের প্যান্ট পরে, সেটা শুধু ঢাকাতেই পাওয়া যায়। এইসব উদাহরণ থেকে আসলে এই ব্যাপারটার ওপরেই দৃষ্টি দিতে চাচ্ছি যে, একজনের ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, আশা—এগুলো সব এখন নির্ভর করছে বিশ্বঘটনার ওপর।

এমন একটা পরিস্থিতিতে আমি একজন লেখক হিসেবে যখন একা, নিভৃতে খাতা-কলম নিয়ে বা কম্পিউটারের সামনে বসছি, তখন আমাকে কিন্তু পুরো বিশ্বটার দিকে চোখ রাখতে হচ্ছে। মুক্তাগাছার সেই বৃদ্ধটিকে, কিংবা ঢাকার ফ্ল্যাটের সেই দারোয়ানটিকে আমি যদি বুঝতে চাই, তাহলে পুরো বিশ্বের সেই ‘বিগ পিকচার’টিকে আমার বুঝতে হবে। গাইবান্ধার সেই যুবকের প্যান্ট বিষয়ক স্বপ্নটাকে যদি বুঝতে চাই, তাহলে যে গ্লোবাল ফোর্স তাকে গাইবান্ধা থেকে ঠেলে ঢাকায় আনছে সেটা বুঝতে হবে। সেই সঙ্গে টেকনোলজি বিশ্বসীমানার ধারণাকে যেভাবে পাল্টে দিয়েছে, তাতে মানুষের মনের ওপর কী অভিঘাত তৈরি করছে সেটাও লক্ষ করবার ব্যাপার। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, ইন্টারনেট পত্রিকা, ইউটিউব, বাংলা টিভি চ্যানেল ইত্যাদির

সুবাদে ভার্চুয়ালি সে বরাবর এখন বাংলাদেশেই থাকে। আবার উল্টো দিকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের এমন অনেককে দেখেছি, যারা শারীরিকভাবে বাংলাদেশে থাকলেও দিনের অধিকাংশ সময় নানা ইলেকট্রনিক এবং গণমাধ্যমের সুবাদে ভার্চুয়ালি থাকে বিদেশের মাটিতে। আন্তর্জালের জগৎ মানুষের দূরত্বের বোধটিকেও পাল্টে দিয়েছে। জার্মানির হাইডেলবার্গে আমার মেডিকেলের ছাত্রজীবনের অনুজ ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখি সে স্কাইপে বসে একই সঙ্গে কথা বলছে তার তিন বোনের সঙ্গে, যার একজন থাকে নিউ ইয়র্কে, একজন দুবাইয়ে, আরেকজন নোয়াখালীতে। তারা পরস্পরের কাছ থেকে নানা রান্নার রেসিপি জেনে নিচ্ছে। এখন বিশ্বায়নের যুগে পুরো পৃথিবীর দৃশ্যপটের এই যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, সেটির দিকে চোখ না রেখে কোনো লেখকের পক্ষে কাজ করা তো দুরূহ। যে ভৌগোলিক অবস্থায় বসেই লিখি না কেন, পুরো বিশ্বটার ছবি আমাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগের একজন লেখকের জন্য এটা একটা বাড়তি চাপ।

কিন্তু বিশ্বায়ন লেখকের জন্য একটা বড় সুযোগ হিসেবেও দেখা দিয়েছে। বিশ্বায়নের কারণে আমি আমার যে ছোট জীবন, আমার যে ভৌগোলিক-জীবন, সেখান থেকে নিজেকে উত্তোলিত করে একটা বড় প্রেক্ষাপটে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। আমি যে দেশ, কাল, সময়ের ভেতর জীবনযাপন করছি, পুরো বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তার অবস্থানটা কোথায়, সেটা বুঝে নেওয়ার একটা সুযোগ এখন তৈরি হয়েছে। আমি যে লেখাটা লিখছি সেটা বিশ্বসাহিত্যের মানচিত্রে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা বিচার করার সুযোগও এখন আগের চেয়ে বেশি। আমার পক্ষে সহজে জানা সম্ভব হচ্ছে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে কোথায় আমার শক্তি, কোথায় আমার সীমাবদ্ধতা। বিশ্বায়নের যুগের একজন লেখক হিসেবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করা উচিত। তা না হলে নিজেকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর দেখবার প্রবণতা তৈরি হয়। অল্পতেই একটা আত্মতৃপ্তির ভাব আসে। মেগালোম্যানিয়া তৈরি হয়।

গবেষণার কাজে একবার বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি জেলা শহরে গিয়েছি। কাজ সেরে আমি আমার স্থানীয় সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের এই শহরে দর্শনীয় কী আছে? তিনি আমাকে বললেন যে তাদের শহরে এশিয়ার বৃহত্তম বাসস্ট্যান্ড আছে। আমি উৎসাহিত হয়ে তা দেখতে চাইলাম। তিনি আমাকে বেশ গর্বের সঙ্গে এশিয়ার বৃহত্তম বাসস্ট্যান্ড দেখাতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, বাসস্ট্যান্ডটি তুলনামূলকভাবে নতুন, বেশ আধুনিক স্টাইলের, মোটামুটি বড়। ওই মফস্বল শহরের চারপাশের যে দারিদ্র্য, ক্ষয়িষ্ণু চেহারা, তাতে ওই বাসস্ট্যান্ডটিকে বেশ স্মার্ট এবং বড়সড়ই মনে হয়। কিন্তু এশিয়ার বেশ কয়েকটা দেশে ভ্রমণের সুবাদে আমি দেখেছি অনেক ছোটখাটো শহরেও এর চেয়ে বড় বাসস্ট্যান্ড আছে। কিন্তু আমার সেই সহকর্মীর ধারণা হয়েছে বা তাকে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে ওইটিই এশিয়ার বৃহত্তম বাসস্ট্যান্ড। তিনিও সেটা বিশ্বাস করে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; কারণ তার দেখার গণ্ডি ওই জেলা শহর পর্যন্তই। লেখালেখির ক্ষেত্রেও এমন প্রবণতা আমি দেখেছি। গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের একটা দুটা বই প্রকাশ করে ব্যাপক আত্মতৃপ্তিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি অনেককে। যেন পৃথিবীর না হলেও অন্তত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইটা তিনি লিখে ফেলেছেন। নানা ক্ষেত্রেই মনের ভেতর এরকম বৃহত্তম একটা বাসস্ট্যান্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ আমি দেখেছি। এই প্রবণতা বিপজ্জনক। আর বিশ্বায়নের যুগে হাস্যকরও।

আজকের সময়ে যিনি লেখালেখি করছেন, দুটো ব্যাপারে তার সেনসিটিভিটি বা সংবেদনশীলতা বিশেষভাবে জরুরি বলে মনে করি। একটি সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, অন্যটি ঐতিহাসিক সংবেদনশীলতা। অবশ্য লেখকের জন্য এই ধরনের সংবেদনশীলতার প্রয়োজন সব সময়েই ছিল, কিন্তু আজকের দিনে এর আবশ্যিকতা আগের যেকোনো সময়ের চাইতে বেশি বলেই মনে করি। সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার কথা এই কারণে

বলছি যে, বিশ্বায়নের এই যুগে পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের দেশের সংস্কৃতি, এক পূর্বের দেশের সঙ্গে আরেক পূর্বের দেশের সংস্কৃতি, শহরের সঙ্গে গ্রামের সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগটা এত তীব্র মাত্রায়, এত দ্রুততায় আর এত ঘন ঘন ঘটছে যে এখন একজন মানুষের পক্ষে বিশেষত একজন লেখকের পক্ষে এই বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়াটা আগের যেকোনো সময়ের চাইতে বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। কালচারাল সেনসিটিভিটির কথা বললে শুরুতে কালচার বা সংস্কৃতির সার কথাটা বোঝা দরকার। সংস্কৃতি বা কালচার এমন একটি টার্ম, যার বহুবিধ একাডেমিক সংজ্ঞা আছে।

মোটা দাগে সংস্কৃতির সার কথাটা বুঝতে আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি ব্রিটেনের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াই। সেখানে প্রায়ই নানা দেশের ছাত্র থাকে। স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে আমাকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়েও কথা বলতে হয়। আমি খুব সহজভাবে সংস্কৃতির সার কথাটিকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি প্রায়ই হোয়াইট বোর্ডে 'সেভেন্টি ওয়ান' সংখ্যাটা লিখি এবং জিজ্ঞাসা করি, এটা কী? ক্লাসে ব্রিটেনের যে ছেলেমেয়েগুলো, নাইজেরিয়ার যে মেয়েটি, ব্রিটেনের যে ছেলেটি তাদের সবার কাছে এটি নেহাত একটা সংখ্যা। কিন্তু ক্লাসে বাংলাদেশের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী থাকলে সে আর সংখ্যাটিকে নেহাত একটা সংখ্যা হিসেবে দেখে না। সেভেন্টি ওয়ান সংখ্যাটি তার কাছে হাজির হয় একটা আবেগ, মূল্যবোধ, ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়ে। এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে আমি যখন সেভেন্টি ওয়ান বা একাত্তর কথাটা উচ্চারণ করছি তখন এই হলরুমে উপস্থিত সবাই আপনারা মুহূর্তের মধ্যে এই সংখ্যাটির সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারছেন। তার মানে কোনো একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আমরা কিছু মূল্যবোধ, আবেগ, ইমেজ পরস্পরের ভেতর সমবায় করি। একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আমরা যে জ্ঞান,

বিশ্বাস, নৈতিকতা, আচার, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিখি, ধারণ করি, একেই মোটা দাগে বলা যেতে পারে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। যেমন সংস্কৃতি কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, এটি জৈবিকভাবে মানুষ পায় না, পায় সামাজিকভাবে; সেই সঙ্গে সংস্কৃতি স্থবির কোনো ব্যাপারও নয়, বরং এটি নানাভাবে অবিরাম বদলাচ্ছে। সর্বোপরি একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতিরও থাকে নানা মাত্রা, নানা উপসংস্কৃতি। এখন আমি এই কালে বসে যখন আমার নিজের সংস্কৃতির কথা লিখছি, কিংবা আমার সামাজিক গোষ্ঠীর বাইরের কারো সংস্কৃতির কথা লিখছি কিংবা অন্য কোনো দেশের সংস্কৃতির কথা লিখছি—তখন আমার সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে আমি যথেষ্ট সংবেদনশীল আছি কি না। এটি এখন আগের চাইতে অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ, এই বিশ্বায়নের কালে আমরা অহরহ আমাদের নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠীর বাইরে, নিজের দেশের বাইরের কোনো সংস্কৃতির মুখোমুখি হচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যার মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আচার আমার মতো না তাকে আমি কীভাবে দেখব, কীভাবে মোকাবিলা করব? আমার বাবার প্রজন্মকে কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ভিন্ন একটা সংস্কৃতির বা ভিন্ন সীমানার মানুষের মূল্যবোধকে মোকাবিলা করতে হতো না। কিন্তু বিশ্বায়নের কারণে আমাকে তা করতে হচ্ছে। ফলে এ প্রশ্ন আমাকে তাড়িত করছে।

সেই প্রশ্নে ফিরে যাই, বিশ্বায়নের এই অভিজ্ঞতাকে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব? অ্যানথ্রোপোলজিতে 'এথনোসেন্ট্রিসিজম' বলে একটা ধারণা আছে। যারা ব্যাপারটা জানেন না তাদের জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে ধারণাটা সম্পর্কে বলি। আমি আমস্টারডামে পড়াশোনা করেছি অনেক দিন। সেখানে আমার এক পরিচিত বাঙালি বিয়ে করেছেন সে দেশেরই এক ডাচ মেয়েকে। তাদের একদিনের এক কথোপকথনের কথা বলি। তারা আমস্টারডামেই আরেক বাঙালি পরিবারে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন। মেয়েটি ফিরে এসে বলছে, 'সেদিন ডিনারে

তোমার সেই বাঙালি পরিবারের লোকজন যেভাবে হাত দিয়ে ভাত মাখাচ্ছিল, আঙুল চেটে খাচ্ছিল তাতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি যে আমরা তো জন্তু না, সুতরাং খাওয়ার সময় আমরা হাত ব্যবহার করি না, চামচ দিয়ে খাই।' তখন সেই বাঙালি পরিচিতটি বলছে, 'ভালো কথা। আমরা যখন দাওয়াত খেয়ে ট্রামে ফিরছিলাম তখন তোমার কি মনে আছে যে আমাদের সামনের সিটে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এসে বসেছিল? কিছুক্ষণ পর মেয়েটা ছেলেটার কোলের ওপর বসল, তারপর একে অন্যকে চুমু খেতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ পর ছেলেটার হাত মেয়েটার সারা শরীরের বিভিন্ন অংশে চলাচল করতে লাগল। এখন কথা হচ্ছে, আমরাও ছোটবেলায় শিখেছি যে আমরা তো জন্তু না, সুতরাং কিছু ব্যাপার আমরা পাবলিকলি করি না, প্রাইভেটলি করি।'

এখন এই যে কথোপকথন, এই যে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি, এখানে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা এই যে এরা দুজনই যার যার নিজস্ব সংস্কৃতির লেন্স, নিজের সংস্কৃতির স্কেল দিয়ে অন্যকে বিচার করছেন। আমি যে মূল্যবোধ, আচার, নৈতিকতায় বড় হয়ে উঠেছি—সেটাকেই সঠিক এবং একমাত্র সত্য বলে বিবেচনা করে অপরের মূল্যবোধ, আচার, নৈতিকতাকে যখন বিচার করতে থাকি তখনই এই সমস্যাটা দেখা দেয়। এই প্রবণতাকেই বলা হয় 'এথনোসেন্ট্রিসিজম।' এর বিকল্প কী? বিকল্প হিসেবে 'কালচারাল রিলেটিভিজম'-এর ধারণাকে প্রস্তাব করা হয়। অর্থাৎ যার যার সংস্কৃতিকে তার মতো করে, তার জায়গা থেকে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে। যেকোনো একটি চর্চাকে দেখবার চেষ্টা করতে হবে তাদের 'পয়েন্ট অব ভিউ' বা দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু এ ধারণাতেও বিপদ আছে। কোনো একটি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চর্চা হচ্ছে বলেই যে-কোনো মূল্যবোধ, আচার, নৈতিকতাকে বিনা বিচারে মেনে নেয়াও সমস্যাজনক। যেমন ধরা যাক, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে মেয়ে ভ্রূণকে হত্যা

করার একটা রেওয়াজ রয়েছে। এখন কালচারাল রিলেটিভিজমের দোহাই দিয়ে কি এই আচারকে মেনে নেয়া যেতে পারে? এখানে তাই 'ক্রিটিক্যাল কালচারাল রিলেটিভিজমের' প্রসঙ্গ আসে। অর্থাৎ যেকোনো সাংস্কৃতিক চর্চাকে একটা বিশ্লেষণাত্মক জায়গা থেকে আমাদের দেখতে হবে। দেখতে হবে কার স্বার্থে এই চর্চাটি হচ্ছে, এই চর্চায় কার ক্ষতির বিনিময়ে কে লাভবান হচ্ছে। জানতে হবে এই চর্চার ইতিহাস।

আমার পরিচিত সেই বাঙালি ডাচ দম্পতির ভেতরকার যে এথনোসিন্ট্রেটিজমের উদাহরণ দিলাম সেটা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কিংবা ইতিহাসে অবিরাম ঘটছে, ঘটেছে। এই এথনোসিন্ট্রেটিজম যখন আগ্রাসী হয়ে ওঠে, আধিপত্যকামী হয়ে ওঠে তখন তা বিপদ ডেকে আনে। ইংরেজরা সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে, আফ্রিকা, এশিয়ায় গেছে তাদের সভ্য বানাতে। সভ্যতার সংজ্ঞা তারাই নির্ধারণ করে এশিয়া, আফ্রিকার বর্বর মানুষদের সভ্য বানানো তাদের দায়িত্ব বলে মনে করেছে এবং সভ্য বানানোর নামে লুটপাট করেছে। হিটলার ঠিক করেছে যে জার্মানরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এবং পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার মূলে ইহুদিরা। ফলে ইহুদিদের নির্মূল করা প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী সে কোটি কোটি ইহুদি নিধন করেছে। পাকিস্তানিরা বরাবরই বাঙালিদের জাতি হিসেবে নিম্নমানের বলে বিবেচনা করেছে। সুতরাং বাঙালিদের শোষণ করতে, হত্যা করতে তাদের বাঁধেনি। এসবই উগ্র এথনোসেন্ট্রিসিজমের উদাহরণ।

এই সব উগ্র এথনোসেন্ট্রিসিজমের বাইরে দৈনন্দিন জীবনেও প্রায়ই আমরা আমাদের শ্রেণিগত অবস্থান থেকে, লিঙ্গগত অবস্থান থেকে একটা এথনোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করি। নিজের তৈরি মাপকাঠিতেই সবকিছুর ভালোমন্দ বিচার করি। তাই একজন লেখক যখন আজকের দিনে কোনো চরিত্র বা জনগোষ্ঠী নিয়ে লিখছেন তখন তিনি তার নিজের এথনোসেন্ট্রিসিজমের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, সেটাই প্রত্যাশা। প্রত্যাশা আমি যে সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি, যা কিছু দেখে-শুনে বড় হয়েছি, সেটাকেই যেন শেষ কথা

ভেবে না বসি। আমার দেশের বাইরের, আমার শ্রেণির বাইরের একজন মানুষের কোনো আচরণ, ভাবনাকে যেন সোজাসাপ্টা ভালো-মন্দের তকমা পরিয়ে না দিই। নিজেদের জীবনযাপনের কারণে, সাংস্কৃতিক অভ্যস্ততার কারণে অনেক কিছুকে আমরা ফরগ্রান্টেট ধরে নিই, প্রশ্ন করি না। তাতে আমাদের দেখার দিগন্ত ছোট হয়ে আসে। মূল্যবোধ, আদর্শ এগুলো যেমন সংস্কৃতির নন-মেটেরিয়াল বা অবস্তুগত উপাদান, তেমনি আছে সংস্কৃতির মেটেরিয়াল বা বস্তুগত উপাদানও।

যেমন ধরুন আমরা সবাই এখানে চেয়ারে বসে আছি। আমরা যখন এই হল রুমে ঢুকেছি তখন ধরে নিয়েছি যে এখানে চেয়ার থাকবে এবং আমরা সবাই সাবলীলভাবে এই চেয়ারে এসে বসেছি। কিন্তু এ দেশের গ্রামে কাজ করতে গিয়ে আমি এমন বহু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা জীবনে কোনোদিন চেয়ারে বসেননি। চেয়ারে বসতে তারা ভীষণ অস্বস্তি, বিব্রত বোধ করেন। চেয়ারের সঙ্গে তাদের কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে চেয়ারও তো নানা রকমের হয়, হাতলওয়ালা চেয়ার, হাতলছাড়া চেয়ার, কোনো কোনো চেয়ারের পেছনটা থাকে উঁচু সিংহাসনের মতো। একেক ধরনের চেয়ার একেক রকম মর্যাদা বহন করে। কথা হচ্ছে চেয়ারকে নেহাত একটা আসবাব ভাবতে গেলেই ভুল করে বসব আমরা, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে প্রেক্ষিতভেদে চেয়ারের অর্থ পাল্টে যায়। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে আমরা অবিরাম এমনি নানা সংস্কৃতির অবস্তুগত এবং বস্তুগত উপাদানের মুখোমুখি হচ্ছি, আমাদের অভ্যস্ত ভাবনা আর বিশ্বাস অবিরাম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, বিশ্বায়নের যুগের একজন লেখককে এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, এই অবস্থা মোকাবিলার পথ খুঁজে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সংবেদনশীলতাটি হচ্ছে ইতিহাস বিষয়ে। আমি আজকে যখন লিখতে বসছি তখন আমি জানি যে ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট কালগর্ভে দাঁড়িয়ে লিখছি। সেই কালগর্ভটা সম্পর্কে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা, একটা সংবেদনশীলতাও খুব জরুরি।

আপনারা জানেন, পৃথিবী একটা সময় সাম্রাজ্যভিত্তিক ইতিহাসের কালপর্ব পার করেছে—রোমান সাম্রাজ্য, গ্রিক সাম্রাজ্য ইত্যাদি। এরপর এসেছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পর্ব। এরপর আমরা এসে পড়েছি উত্তর-ঔপনিবেশিক কিন্তু নয়া সাম্রাজ্যবাদী একটা পর্বে। কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবী একটা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভেতর দিয়েই চলেছে। মাঝখানে শুধু একটা আঘাত এসেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু হয়েছে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে। কিন্তু একশ বছরের কম সময়ে সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাতেও একটা বড় আঘাত এসেছে। ধস নেমেছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। বলা যেতে পারে আমরা এরপর ইতিহাসে পোস্ট সোশ্যালিস্ট বা উত্তর-সমাজতান্ত্রিক একটা পর্বে প্রবেশ করেছি।

আশির দশকের শেষে যখন বার্লিন দেয়াল ভেঙে পড়ল তখন অনেক ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদই বললেন সমাজতন্ত্রের কবর হয়ে গেছে, এখন থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইতিহাসই হবে আগামী পৃথিবীর ইতিহাস। *এন্ড অব হিস্ট্রি, গুড বাই মিস্টার সোশ্যালিজম* এ ধরনের বই লেখা হলো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ধসের পর কয়েক দশক পার হতে চলেছে কিন্তু এর মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা পৃথিবীর জন্য বিশেষ কোনো সুখবর বয়ে এনেছে, এমন কোনো নমুনা নেই। বরং বিশ্ব অর্থনীতি আরো জটিল পাকচক্রে পড়েছে। ইউরোপ ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা অতিক্রম করছে। বার্লিন দেয়াল ভেঙেছে ঠিকই কিন্তু পৃথিবীজুড়ে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন অনেক অদৃশ্য দেয়াল। জাতিগত, ধর্মগত অবিশ্বাস, বৈষম্য বেড়েছে। আপনারা দেখেছেন গত কয়েক বছরে ইউরোপে অনেকগুলো জাতিগত দাঙ্গা হয়েছে। লন্ডনে যে বিরাট রেসিয়াল রায়ট হলো সম্প্রতি, এমনটা আর তাদের ইতিহাসে হয়নি।

আমরা সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন দেখেছি, যেখানে তথাকথিত উন্নত দেশের বঞ্চিত মানুষেরা বৈষম্যের প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমি দেখেছি মুক্তবাজার অর্থনীতির

সুবাদে অনেক উন্নয়নশীল দেশে একধরনের জৌলুশ যেমন বেড়েছে, তেমনি ব্যাপক বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের ফারাক। একধরনের বিকৃত উন্নয়ন ঘটেছে সেসব দেশে। পৃথিবীজুড়ে বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। কথিত উন্নত দেশেও আছে দরিদ্র বা অভিবাসীদের ঘেটো। বস্তুগত অর্থেও উঠেছে দেয়াল, প্যালেস্টাইনের মাটিতে উঠেছে নতুন নতুন ইসরায়েলি দেয়াল। সুতরাং মুক্তবাজার অর্থনীতি মানুষের মুক্তির যে জয়ধ্বনি করেছিল তার কোনো নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সমাজতন্ত্র কাজ করেনি কিন্তু পুঁজিবাদও কাজ করছে না। কোনো ব্যবস্থাই সামজিক নিরাপত্তা আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সফল সমন্বয় করতে পারেনি। এখন পুঁজিবাদকে মানবিক করার নানা চেষ্টা চলছে। 'হিউম্যান ফেইস অব ক্যাপিটালিজমের' কথা বলা হচ্ছে। এখন নানা উদ্ভাবনী উপায়ে ক্যাপিটালিজম তার নিজের দুর্বলতাগুলোকে কাটানোর চেষ্টা করছে। কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটির কথা বলা হচ্ছে। কনজামশন আর চ্যারিটিকে একত্র করে ব্যবসা করা হচ্ছে।

আপনি একটা পণ্য কিনবেন বা এক কাপ কফি খাবেন এখন একটু বেশি দামে কিন্তু আপনাকে জানানো হবে যে এই অর্থের একটা অংশ যাবে আফ্রিকার দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়া বা খাবারের ব্যবস্থা করতে। এতে যিনি পণ্যটা কিনছেন তিনি যেমন ভোগ করছেন আবার মানবসেবা করার একটা আত্মতৃপ্তিও পাচ্ছেন। এতে করে ব্যবসা বাড়ছে আবার ব্যবসার মাধ্যমে তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগিতাও করা যাচ্ছে। কিন্তু সমাজ কাঠামোতে কোনো আঘাত না করে এসব নানা উপশমের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতির বিপর্যয় যে ঠেকানো যাবে না, সে কথা এখন অনেক সমাজ-ভাবুকই বলছেন। আজকের মানবসমাজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে তার সমাধান নেই, অনেক দার্শনিক, সমাজ-ভাবুক নতুন করে আবার তা জোর গলায় বলছেন। নোয়াম চমস্কি অবিরাম পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষতগুলো নগ্ন করে দেখাচ্ছেন। ফরাসি দার্শনিক আলাঁ্যা

বাদিউ এখনো সমাজতন্ত্রেই তার আস্থা রাখছেন।

দার্শনিক স্লাভয় জিজেক নতুন ব্যাখ্যায় প্রবল দাবি তুলেছেন যে কমিউনিজমের ভেতরই আবার আমাদের মুক্তি খুঁজতে হবে। কিন্তু এই কমিউনিজম সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রক্রিয়ায় কমিউনিজমের পথে যেতে চেয়েছিল সে পথে না। তিনি বলছেন কমিউনিজমকে 'হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি' ভেবে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদের নতুন পথ খুঁজতে হবে। অতীতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পথে এগোতে হবে আমাদের। সমাজতন্ত্রের নতুন মডেলের কথা ভাবতে হবে। সোশ্যালিজম আর ক্যাপিটালিজমের একটা মিশ্রণ অনেক দেশে চর্চা হচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়েছিল পুঁজিবাদের জন্য গণতন্ত্র আবশ্যিক একটা শর্ত কিন্তু চীনে তো তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে একধরনের অথরেটেরিয়ান ক্যাপিটালিজম চর্চা হচ্ছে। ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুরে যে অর্থনীতি চর্চা হচ্ছে সেটাও ঠিক টিপিক্যাল মুক্তবাজার অর্থনীতি না। সেসব দেশেও নানা ত্রুটি আছে, ঝামেলা আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে কোনো রক্ষণশীল ফ্রেমওয়ার্কে বেঁধে সাম্যবাদী সমাজের আন্দোলনকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। নতুন আলোকে ভাবতে হবে। এবং ভাবতে হবে সাম্যবাদের মূল প্রস্তাবনার আলোকেই।

মানুষ মঙ্গলগ্রহে যেতে পারবে, প্রতিবছর আইপ্যাড, কম্পিউটারের নতুন নতুন সব ডিভাইস বের করতে পারবে কিন্তু মানুষে মানুষে বৈষম্য ঘোচাতে পারবে না, সেটা তো হতে পারে না। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের ভবিষ্যৎ-পথ নির্ধারণ তো আরো জটিল। পাশ্চাত্যের চিন্তকরা যেভাবে গণতন্ত্র, উন্নয়ন, আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, সেই ফ্রেমওয়ার্কেই এসব দেশের চিন্তকরা বরাবর ভেবেছেন। পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজের ভাবুকরা অবশ্য এই ভাবনায় আঘাত করেছেন। আমাদের এই অঞ্চলের চিন্তার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দিগন্ত উন্মোচন করেছেন সাবঅলটার্ন স্টাডিজের